নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ১৬ পৃ: ১২৯-১৪৫
© ২০১১ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

মাসউদ ইমরান[ক], সাবিকুন নাহার[খ],
কাজী মেহেদি হাসান[গ], রাবেয়া আক্তার[ঘ]

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর-এর ১৭ ও ১৮ নম্বর গ্যালারিতে প্রত্ন-প্রতিমার 'রেপ্রিজেন্টেশন'[১]: একটি পর্যালোচনামূলক বিশ্লেষণ

প্রস্তাবনা

'মামা অস্থির অবস্থা...'

'কী অসভ্য ব্যাপার...'

'বাচ্চাদের নিয়ে কি দেখা যায়-এসব!'

'এগুলোকে একটু সভ্য করে প্রদর্শন করলেও পারতো।'

'মাআমা কী দেখাইলা???????????????'

'আবার আইতে অইবো...'

ওপরের অভিব্যক্তি সমূহ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে আগত দর্শনার্থীদের। সতের ও আঠারো নম্বর গ্যালারিতে প্রদর্শিত বিভিন্ন প্রত্ন-প্রতিমা দর্শন-এর সময়ে তারা এসব মন্তব্য করেছেন। একজন যুবক তার সাথের বোরকা পরিহিতা স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে আফসোসের সুরে বলছে 'তোমার এমন ফিগার থাকলে ভাল হতো'। আরেকজন প্রেমিকা তাঁর প্রেমিককে উমা-মহেশ্বর প্রতিমাটির সামনে থেকে দ্রুত সরিয়ে নেবার সময় বলছে, 'অসভ্য কোথাকার'। একজন মা তার বাচ্চাদের প্রত্ন-প্রতিমার গ্যালারি থেকে কিছু দেখতে না দিয়ে পাশ-কাটিয়ে চলে যান। আমরা বিষয়টি জানতে চাইলে বলেন, 'বাচ্চাদের এই সব জিনিস না দেখানোই ভাল'। বিশেষ করে যুবক ও মধ্য বয়সী দর্শনার্থীদের দৃষ্টিতে খেলে যাচ্ছিল পর্নোগ্রাফি দেখার আনন্দ। এরা সবচেয়ে বেশি সময় ব্যয় করছিলেন প্রত্ন-প্রতিমার গ্যালারি দুটিতে। কাউকে কাউকে গোপনে প্রত্ন-প্রতিমার নানা অঙ্গ ছুঁয়ে দেবার গোপন প্রচেষ্টায় লিপ্ত হতেও দেখলাম। বর্তমান লেখাটির লেখকদের একজন: রাবেয়া গল্পের ছলে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিরাপত্তা কর্মীর একটি পর্যালোচনা জানতে পারেন। প্রত্ন-প্রতিমাগুলোতে তিনি দেখালেন, যেমন- প্রতিমার বুক, উরু ও পেট এসব স্থান বেশ উজ্জ্বল অর্থাৎ ধুলা পরিষ্কার। কিন্তু বাকি স্থানে ধুলা জমে আছে। অর্থাৎ ওইসব স্থানে হাত দেয়া হয়েছে বা নিয়মিত হাত দেয়া হয়। অবশ্য এর বেশিরভাগ ঘটনাই ঘটে নিরাপত্তা কর্মীদের অগোচরে।

ক, খ. প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। গ. ব্যাংক কর্মকর্তা, ন্যাশনাল ব্যাংক, সাভার, ঢাকা।
ঘ. নিবন্ধন কর্মকর্তা, বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর, ৩২ ধানমণ্ডি, ঢাকা।

দর্শনার্থীগণ এমন আচরণ কেনো করছেন প্রত্ন-প্রতিমার প্রদর্শনীতে—এ প্রশ্নের উত্তর কী হবে? আমরা যদি কিউরেটোরিয়াল নোট-এর দিকে তাকাই দেখব সেখানে সেক্যুলারিজমের চর্চার এবং আইকোনোগ্রাফির বিচারে এক যৌন-উত্তেজক বর্ণনার উপস্থিতি। আমরা প্রথমেই এ-ধরনের নোট-এর সবচেয়ে আলোচিত উদাহরণ হিসেবে 'দিদারগঞ্জ যক্ষী'র বর্ণনাটি নিম্নে উল্লেখ করছি। 'দিদারগঞ্জ যক্ষী'কে গুরুত্বের সাথে নেবার একটি বড় কারণ ভারতের স্বর্ণ যুগ হিসেবে পরিচিত গুপ্ত যুগের প্রতিনিধিত্বকারী নিদর্শন হিসেবে এই যক্ষী সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করেছেন। যদিও বর্তমানে এটি গুপ্ত পূর্ব সময়ে তৈরি হয়েছে হিসেবে পুনঃ পরিচিতি প্রাপ্ত হয়েছেন। এর কিউরেটোরিয়াল নোট-এ প্রমদ চন্দ্র (গুহ-ঠাকুরতা ২০০৪: ২০৫) নিম্নের বর্ণনাটি সংযুক্ত করেছিলেন। তা হলো:

> "[সে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে] নারী সৌন্দর্যের ভারতীয় আদর্শের প্রাচীনতম দৃশ্যমান বিবৃতি হিসেবে, যে আদর্শ ভারতীয় শিল্প ও সাহিত্যে প্রতিনিয়ত প্রকাশিত হয়েছে। প্রশস্ত কোমর এবং পূর্ণ বক্ষ, জন্ম ও উর্বরতার সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত শারীরিক বৈশিষ্ট্যসমূহকে জোড় দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। ভাস্কর সৌন্দর্য এবং উর্বরতা রূপে সৌন্দর্যের এই প্রাচীন ধারণাকে [বিশেষভাবে প্রকাশের জন্য] দুগ্ধ পূর্ণ ভারী বক্ষ যুগলের সম্মুখ-ভাগের নীচের দিকে বাঁকান ক'বন্ধ তৈরি করেছেন, যার মধ্য দিয়ে তিনি একটি কাব্যিক ভাব/অনুভূতি জাগানোর চেষ্টা করেছেন।"[২]

ওপরে উল্লেখ্য বিষয় দুটির দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, একটি হলো বিভিন্ন বয়স, পেশা ও রাজনৈতিক অবস্থান থেকে উঠে আসা সাধারণ মানুষদের অবস্থান এবং দ্বিতীয়টি হলো প্রত্ন-প্রতিমার তাত্ত্বিক ও জাদুঘরীয় গবেষকের অবস্থান। আমাদের উদ্দেশ্য হলো, সাধারণের কাছে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রদর্শিত প্রত্ন-প্রতিমা জাতীয় ঐতিহ্যের চিহ্নায়ক হিসেবে কোন ধরনের জ্ঞান উৎপাদন করে এবং জ্ঞান উৎপাদনে প্রতিষ্ঠিত কিউরেটোরিয়াল নোট সেক্যুলারকরণের আওতায় যে বর্ণনা উপস্থাপন করে তা কতটা প্রদর্শিত প্রত্ন-প্রতিমার ইতিহাসকে বুঝতে সহযোগিতা করে? এ ক্ষেত্রে রেপ্রিজেন্টেশনের তত্ত্বীয় অবস্থান (আহমেদ ২০০৪ এবং হল ১৯৯৭ ও ২০০১) ও জাদুঘর তত্ত্বর (গুহ-ঠাকুরতার ২০০৪ এবং ম্যাকডোনাল্ড ১৯৯৮) কাজকে কেন্দ্রীয় পাটাতন হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি

আমাদের গবেষণায় নিম্ন বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। তা হলো:

১. বিস্তৃত পরিসরে প্রদর্শনী ও দর্শনার্থীদের নানা পর্যায়ের পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বর্তমান গবেষণা-প্রশ্নর উত্তর খুঁজতে শুরু করি। এ ক্ষেত্রে—

ক) আমরা ৪/৫দিন ধরে বিভিন্ন বিভাগে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে জাদুঘরে যাই। সেখানে তাদের অভিব্যক্তি ও শব্দ চয়ন এবং বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য হিসেবে প্রদর্শিত এ-প্রত্ন-প্রতিমাসমূহের প্রতি তাদের আচরণের পাঠ নেয়ার চেষ্টা করি।

খ) পাশাপাশি এখানে আগত বিভিন্ন দর্শনার্থীদের সাথে অনানুষ্ঠানিক গল্পে মেতে উঠতে বা তাদের ভাষা ভঙ্গির সাথে নিজেদের ভাষা ভঙ্গির সম্মিলন করে তাদের মতো হয়ে উঠতে চেষ্টা করি।

গ) বন্ধুদের মধ্যে 'নারীর শরীর', ''প্রত্ন-প্রতিমা', 'নায়িকা', 'সিনেমা', 'ইতিহাস', 'ঐতিহ্য', 'পর্নোগ্রাফি', 'শিল্প' প্রভৃতি বিষয় নিয়ে পরিকল্পিতভাবে তর্ক জুড়ে দেই। এর একটি বড় কাজ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের, শহীদ সালাম-বরকত হলের কয়েকটি কক্ষে করা হয়।

এভাবে বিভিন্ন ধরনের আড্ডা ও পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে আমরা আমাদের প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে থাকি। আমরা আমাদের গবেষণার পরিকল্পনানুযায়ী বিভিন্ন পর্যায়ে তার রেকর্ড রাখি। তবে সংগত কারণেই আমরা সাক্ষাৎপ্রদানকারী ও আড্ডার বন্ধুদের নাম উহ্য রাখছি। স্বভাবতই একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে আমাদের বক্তব্যর সত্যতা নিয়ে। এক্ষেত্রে প্রবন্ধের পাঠক হিসেবে আপনার সচেতন রাজনৈতিক অবস্থানই যথেষ্ট বলে আমরা মনে করছি।

বর্তমান প্রবন্ধের একটি বড় বিষয় হলো, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের এ-ধরনের প্রদর্শনী দেখতে আসার উদ্দেশ্য এবং প্রদর্শনীতে প্রত্ন-প্রতিমার অর্থের পরিবর্তন কীভাবে হয় তা বোঝার চেষ্টা করা। অর্থের পরিবর্তন শুধু কী দর্শনার্থীদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংকটের ভেতর থেকে নির্মিত নাকি এই প্রদর্শনীর পরিকল্পনাকারী প্রতিষ্ঠানেরও ভূমিকা এখানে সচল? এক্ষেত্রে ফিরে তাকাতে হবে জাদুঘরের মতো প্রতিষ্ঠান কীভাবে ইতিহাস ও ঐতিহ্য প্রদর্শনকারীর ভূমিকায় কোন প্রেক্ষাপটে ভারতে শুরু করেছিল এবং সেখানে কোন ধরনের জ্ঞানতাত্ত্বিক কাঠামোর ভেতরে প্রদর্শনের রাজনীতি নির্মিত হলো? একই সাথে ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদী ভূমিকা এবং প্রথমে ভারতীয়, পরে পাকিস্তানি মুসলমান জাতীয়তাবাদ এবং তারও পরে বাঙালি মুসলিম জাতীয়তাবাদের রাজনীতির অধীনে বর্তমান বাংলাদেশে ইতিহাস-ঐতিহ্য হিসেবে পরিচিত এই প্রত্ন-প্রতিমা কোন ধরনের পাঠ নিয়ে হাজির হচ্ছে বাংলাদেশের জাতীয় জাদুঘর হতে শুরু করে অপরাপর জাদুঘরসমূহে। অর্থাৎ সত্য ও মূল্যবোধ, ধর্ম, আধুনিকতা, যৌনতা, বৈজ্ঞানিক প্রদর্শন ব্যবস্থার রাজনীতি এবং জ্ঞান ও ক্ষমতা কীভাবে লেপ্টালেপ্টি করে একে অপরের কাঁধে চড়ে জাতীয় সংস্কৃতির জ্ঞান এবং নারী নিপীড়নের ঐতিহ্যকে পুনরুৎপাদন, বিতরণ ও প্রদর্শন করছে জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারক হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।

জাদুঘরীয় রেপ্রিজেন্টেশন তত্ত্ব: প্রতিমার অর্থের বদল

জাদুঘরে পদ্ধতিগত রেপ্রিজেন্টেশনের মাধ্যমে প্রত্ন-প্রতিমা নিজ অর্থ থেকে বিচ্যুত হয়ে ঐতিহ্য, ইতিহাস, জাতীয় সংস্কৃতি নামে প্রকাশ্য এবং উত্তেজক পর্নোগ্রাফি হিসেবে পরোক্ষভাবে অর্থের পুনরুৎপাদন করছে। ভারতবর্ষের অতীত অন্বেষণের প্রথম পর্যায় থেকে এ-ধরনের বদল ঘটার সূত্রপাত লক্ষণীয়। যাদের হাত ধরে প্রত্ন-প্রতিমা 'ঐতিহ্য' হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে তাদের

মধ্যেই ঘটে গেছে দেখার বদল। "নির্লজ্জ এবং আত্ম-তৃপ্ত নগ্নতা"[৩] হিসেবে ১৮৭০-এ আলেকজান্ডার কানিংহামকে মথুরা পিলারের যক্ষীর বর্ণনা করতে দেখি। তিনি আগ বাড়িয়ে আরও ভয়াবহ মতামত প্রদান করেন। তা হলো, প্রাচীন ভারতীয়দের মধ্যে কমপক্ষে একটি সুনির্দিষ্ট শ্রেণির নারীরা জনসম্মুখে প্রায় নগ্ন অবস্থায় নিজেদের রেপ্রিজেন্ট করা ছিল একটি স্বাভাবিক বিষয়।[৪]

আধুনিকতাবাদী, প্রগতিশীল, সেক্যুলার জ্ঞান চর্চার অধীনে প্রত্ন-প্রতিমা বিশ্লেষণের কৌশলটি রাজেন্দ্র লাল মিত্র (১৯৭২), অবনীন্দ্র ঠাকুর (১৯১৪), রাম রাজ (১৮৩৪), হেনরি হার্ডি কোল (১৮৭৪), জেমস ফার্গুসন (১৮৬৪) প্রমুখ পণ্ডিতগণের কাজের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। তাদের কাজের মাধ্যমে যৌন আবেদনময়ী নারীর শরীরকে আইকোনোগ্রাফির মতো বিদ্যাশাস্ত্র প্রয়োগের মাধ্যমে স্পর্শকাতর 'ভাস্কর্য' জননীতে পরিণত করেছে। অর্থাৎ আধ্যাত্মিকতার সাথে সংযুক্ত করে নতুন কাঠামো ও অর্থ নির্মাণ করা হয়েছে। পশ্চিমা রীতিতে পৌনঃপুনিক শারীরিক মাপজোখের পাশাপাশি আধ্যাত্মিকতা ও বিভিন্ন মৌখিক গাঁথা ও ধর্মীয় চর্চার সাথে সংগতি রেখে এক নতুন বিদ্যার চর্চা শুরু হয়। এর পাশাপাশি যৌন আবেদনময়ী প্রত্ন-প্রতিমা তার পরিপার্শ্বের বিভিন্ন গাছগাছড়ার চিহ্নের নয়া নয়া ব্যাখ্যার মাধ্যমে আনন্দ কুমারাস্বামীর (১৯১৪) পাণ্ডিত্যের গুনে ৩০-এর দশকের দিকে এসে উর্বরতার দেবি হিসেবে যক্ষীর নতুন পরিচয় নির্মিত হয়।[৫] এ-ক্ষেত্রে ফুকোর ক্ষমতা-জ্ঞানের বিশ্লেষণে দৃশ্যমানতার তত্ত্ব অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। তার যুক্তিতর্ক হলো, দৃশ্যমানতার ঘটনাটি কোনো স্বয়ংক্রিয় কিংবা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া নয়।[৬] ক্ষমতা জ্ঞান আমাদের কী দেখতে দিক-নির্দেশনা দেয়, সেটি কীসের সাথে যুক্ত? আর তাই, কুমারাস্বামী 'আধ্যাত্মিক ভারতীয় শিল্প'-এর যে ধারণা প্রদান করে, সেখানে যক্ষীর মতো ভাস্কর্যসমূহও সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়। কারণ, এসব ভাস্কর্যসমূহ নারীর অবয়বে উন্মুক্ত এবং প্রবল কামুকতা নিয়ে দর্শকের মুখোমুখি হয়। আর তাই, ভারতীয় শিল্প ইতিহাস পুনরুদ্ধারের জন্য বিভিন্ন জটিল রীতির প্রয়োজন হয়। যার দ্বারা তাদের নগ্নতাকে 'শারীরিক' থেকে 'প্রতীকী' স্তরে পরিবর্তন করা যাবে; যার দ্বারা 'উলঙ্গ' শরীর দর্শন করা যাবে মূর্তিতত্ত্ব ও সৌন্দর্যতত্ত্বের মাধ্যমে। এভাবে অপার্থিব এবং যৌন প্রতিমার যুগপৎ নির্মাণের মাধ্যমে জাতীয় শিল্প ইতিহাস গঠন করা হয়। এখানে একদিকে ধ্যানরত বৌদ্ধ প্রতিমাগুলো ভারতীয় 'আধ্যাত্মিকতাবাদের' প্রতিরূপ হিসেবে থাকে, অপরদিকে থাকে স্বর্গীয় এবং পার্থিব প্রত্ন-প্রতিমাসমূহ—যাদের সৌন্দর্য স্পষ্টতই এবং মাত্রাতিরিক্ত ভাবে 'শারীরিক'। এই নতুন জ্ঞান শিক্ষা-গবেষণা ক্ষেত্রে নতুন মানদণ্ড অর্পণ করলেও রেপ্রিজেন্টেশনের কৌশলের মাধ্যমে এবং নয়া দেশের নয়া শিক্ষা ও সামাজিক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় প্রত্ন-প্রতিমা 'মাতা' হিসেবে দেখার বদলে পুনরায় রূপ লাভ করে মুসলিম দর্শকের কাছে যৌন আবেদনময়ী 'উলঙ্গ' নারী হিসেবে।

আধুনিকতাবাদী আইকোনোগ্রাফি চর্চার মাধ্যমে জাতীয় ঐতিহ্য হিসেবে প্রত্ন-প্রতিমাকে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে 'শিল্প', 'ধর্ম' এবং 'নৈতিকতা'র মধ্যের সীমারেখা স্পষ্টভাবে বিভাজ্য নয়। এই অস্পষ্টতা প্রত্ন-প্রতিমাকে এক যৌন আনন্দের সহায়ক জ্ঞান হিসেবে জাদুঘরে উপস্থাপিত হয়েছে। নারীর নগ্নতা ইউরোপীয় শিল্পকলায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শৈল্পিক প্রতিমা হিসেবে দেখা

হয়। আধুনিকতাবাদী ভারতীয় শিল্প ইতিহাসও একই ভাবে নগ্নতার ক্ষেত্রে নিজস্ব এবং বিরোধপূর্ণ ঐতিহ্যের একটি পথ প্রদর্শন করেছে। এরই অনুগামী হিসেবে আজকের বাংলাদেশও ঐতিহ্য, নৈতিকতা, ধর্ম এবং জাতীয় পরিচয় নির্মাণের ক্ষেত্রে বিরোধপূর্ণ অবস্থায় পৌঁছে দিয়েছে বর্তমান দর্শকদের। বস্তুত নিরাভরণ প্রত্ন-প্রতিমা সনাতনী ধর্মের মানুষদের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ মূর্তি-তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য। এ-কারণে ভারতীয় শিল্প ইতিহাসে নগ্নতাকে সনাতনী ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে এবং একে ভারতীয় শিল্প বিকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেয়া হয়েছে। তবে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের হাত ধরে স্বাধীনতা-উত্তর উত্তর-ঔপনিবেশিক জাতি-রাষ্ট্র হিসেবে ভারত শিল্প সমৃদ্ধ ঐতিহ্য-শিল ভারতের ইতিহাস প্রচার কল্পে নগ্ন প্রত্ন-প্রতিমার বিস্তৃত প্রদর্শন শুরু করে। খাজুরাহো মন্দির পরিণত হয় 'প্রেমজ' প্রত্ন-প্রতিমার নগ্ন প্রদর্শনের এক '*লাইভ*' জাদুঘরে। যদিও খাজুরাহো মন্দিরের দেয়াল গাত্রে উৎকীর্ণ প্রত্ন-প্রতিমাসমূহের মধ্যে একটি খুবই সামান্য অংশ জুঁড়ে প্রেমজ প্রত্ন-প্রতিমা রয়েছে। লাক্‌সমনা, বিশ্বনাথ এবং খান্ডারিয়া-মহাদেব—এই তিনটি প্রধান মন্দিরের মাত্র ১৬টি বৃহৎ প্যানেলে যৌন কার্যকলাপ ও যৌন ভঙ্গি উৎকীর্ণ রয়েছে। অথচ গত কয়েক দশক ধরে খাজুরাহো মন্দির কমপ্লেক্সের কতিপয় প্রেমজ প্রত্ন-প্রতিমার ফটোগ্রাফিক পুনরুৎপাদনের মাধ্যমে 'কাম-উদ্দীপক' প্রাচীন যৌন-লীলার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পরিণত করেছে। এ-ফটোগ্রাফিক পুনরুৎপাদন অর্থাৎ আকৃতি বড় করে শুধুমাত্র মিথুন-মৈথুন প্রতিমাকে কেন্দ্রে রেখে ভারতীয় শিল্পকে প্রদর্শনের কৌশলটি প্রথম শুরু করেন জেমস ফারগুসন। নতুন নতুন বই, অ্যালবাম, পোস্টার, ভিউ কার্ড-এ এ-সব ফটোগ্রাফ এবং প্রত্ন-প্রতিমার শরীরী বর্ণনা সংযুক্ত করার মাধ্যমে প্রাচীন ভারতীয় প্রেমের প্রতিরূপ ও জাতীয় ঐতিহ্য হিসেবে রেপ্রিজেন্টে হতে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, খাজুরাহো মন্দিরের হাজার বর্ষপূর্তিতে প্রদর্শিত ফটোগ্রাফের শিরোনাম ছিল: 'Divine Ecstasy' বা স্বর্গীয় উল্লাস, 'The Playground of the Gods' বা দেবতাদের লীলাক্ষেত্র, 'Temple of Love' বা ভালোবাসার মন্দির, 'The High Noon of Hindu Sexuality' বা হিন্দু যৌনতার পূর্ণতা প্রাপ্তি। গুহ-ঠাকুরতার (২০০৪: ২৩৯) মতে, এই ধরনের প্রচারণার ফলে মন্দিরের স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য সম্পর্কিত বৈশিষ্ট্যগুলো সামগ্রিকভাবে অবলোকন না করে এবং ভাস্কর্যসমূহের মহাজাগতিক এবং ধর্মীয় প্রতীকী অর্থ অনুধাবন া করে দর্শকের দৃষ্টি কেবল মন্দির গাত্রে উৎকীর্ণ অল্প-কিছু-সংখ্যক প্রেমজ প্রত্ন-প্রতিমাসমূহের ওপর নিবদ্ধ হয়ে পড়ে।

আইকোনোগ্রাফি, সাঁচি, মথুরার প্রত্ন-প্রতিমা বা দিদারগঞ্জ যক্ষী এক অনন্য ভারতীয় শিল্পকলাকে প্রদর্শন করছে এবং তা মুসলিম পূর্ব সময়কে স্বর্ণ যুগ হিসেবে পরিচিত করতে মূল ভূমিকা পালন করছে। তবে এসব প্রত্ন-প্রতিমাকে অতীত মানুষের ধর্মীয় ব্যবস্থাপনা ও চর্চার উদযাপন হিসেবে দেখার চেষ্টা করেছে ভারতীয় ও পশ্চিমা আধুনিক, সেক্যুলার পণ্ডিতগণ। যারা নিজেদেরকে ধর্মীয় ব্যবস্থাপনার অধীন হয়ে না পড়ার চেষ্টায় ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ 'বস্তু' হিসেবে রেপ্রিজেন্টেশনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আর তাই জাদুঘরে প্রদর্শনের সময় এ-সকল যক্ষী তার প্রাপ্ত ভক্তি ও ভক্তদের দেয়া উপহারের বাইরে এসে শুধুমাত্র ইতিহাস ও ঐতিহ্য পাঠের অংশে পরিণত হয়। এ-ক্ষেত্রে ওয়ালটার বেনজামিন দেখিয়েছেন যে, শিল্পকলার আধুনিক

দেখার ভঙ্গি ও আকর ধারণা সমূহের নির্মাণে শিল্পের সেক্যুলারকরণ এক গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হিসাবে কাজ করেছে।[৭] প্রাক-আধুনিক সময়ে ধর্মীয় আচারের সঙ্গে শিল্পকলার যে বিজড়ন সেটি আধুনিক জাতি-রাষ্ট্রের অবস্থার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ না হওয়ায় রাষ্ট্র ও শাসন প্রণালির সেক্যুলারকরণের পাশাপাশি শিল্পকর্মের সেক্যুলারকরণও অনিবার্য হয়ে পড়ে। জাদুঘরের ধারণার রূপান্তরকেও আমার এই সেক্যুলারকরণের ইতিহাসে রেখে বিচার করতে পারি। প্রাচীন গ্রিসে মুউজিয়নগুলো যেভাবে ধর্মীয় আচরণের সঙ্গে সারবত্তাগতভাবে যুক্ত ছিল, আধুনিক জাদুঘরে সেটি আর থাকল না। আধুনিক জাদুঘরকে সেই অর্থে আধুনিক রাষ্ট্রের তথাকথিত সেক্যুলার পাবলিক স্পেসের বর্ধিত অংশ হিসাবে শনাক্ত করা যায়। আসাদ আধুনিক জাতি-রাষ্ট্রের সেক্যুলার পাবলিক স্পেসের এবং রিলিজিয়াস প্রাইভেট স্পেসের ধারণা পর্যালোচনা করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে সেক্যুলার পাবলিক/রিলিজিয়াস প্রাইভেট স্পেসের ধারণাকে যেভাবে রেপ্রিজেন্ট করা হয় সেভাবে নেই অর্থাৎ বিভাজন অস্তিত্ববান থাকে না রাষ্ট্রের রাজনৈতিক পরিসরে।[৮] আধুনিক ক্ষমতা-সম্পর্ক এখানে এমন অসমতা তৈরি করে যে এই স্পেসে ক্রিয়াশীল সব পক্ষ সমানভাবে সক্রিয় থাকতে পারে না। বাংলাদেশে জাতীয় জাদুঘরের প্রত্ন-প্রতিমা রেপ্রিজেন্টেশনকে বুঝতে গেলে এই ঐতিহাসিক রূপান্তর ও তৎজনিত দ্ব্যর্থকতা ও স্ববিরোধিতাসমূহকে মাথায় রাখা জরুরি।

জাদুঘরীয় রেপ্রিজেন্টেশন আজকের সময়ে এসে বৈজ্ঞানিক নিয়ন্ত্রণবাদী চিন্তার অধীনে নানা গবেষণার মাধ্যমে এক নতুন বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানে পরিণত হয়েছে যেখানে পদ্ধতিগত রেপ্রিজেন্টেশন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিচার্য বিষয়। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরও এ প্রকল্পের অধীনেই নিজের রেপ্রিজেন্টেশন পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটিয়েছে। একে নয়া-ঔপনিবেশিকতাবাদী প্রকল্প হিসেবে চিহ্নিত করতে আগ্রহী। আর ঔপনিবেশিক জ্ঞানতাত্ত্বিক সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণ এমন পরিস্থিতিসমূহ তৈরি করেছিল যাতে ইউরোপীয় নৃ-বিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, প্রগতির ধারণা, ব্যক্তিবাদ, বিবর্তনবাদ ইত্যাদি বিষয়গুলো শুধু ইউরোপের অর্থনৈতিক ও সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণের বৈধতা প্রদানের একটি জ্ঞানকোষীয় দলিল হিসাবে কার্যকর হয়নি বরং "ইউরোপীয় নিজ" ও "অপরত্ব" নির্মাণের একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিসর হিসাবে জাদুঘরগুলো বিকশিত হয়, প্রতিষ্ঠিত হয় এবং রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। তবে জাদুঘরের রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়ে ওঠার ইতিহাস একমাত্রিক নয়। বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ও অবস্থানে আধুনিক রাষ্ট্র, জাতি, নর-বর্ণ, ধর্মের ধারণাসমূহের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে জাদুঘর তার আজকের রূপ পরিগ্রহ করেছে।

জাদুঘরে প্রত্নবস্তু প্রদর্শনের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত বেশ কিছু বিষয়ের অবতারণা হয়েছে বেশ কিছু কাল ধরে। পূর্বেই উল্লেখ করেছি পদ্ধতিগত প্রদর্শনের একটি বৈধতা সূচক হলো বিজ্ঞানসম্মত প্রদর্শনের তরিকা। অর্থাৎ জাদুঘরের সাথে বিজ্ঞানকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে শুধুমাত্র প্রত্যেকের রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক কার্যকারিতাকে বোঝার জন্যই নয়, বরং এ-দুয়ের মধ্যে আন্তঃসম্পর্কের ডিসকার্সিভ অবস্থানকে বোঝার জন্যও। জাদুঘরে প্রত্নবস্তুর প্রদর্শন হলো একটি কেন্দ্রীয় বিষয় এবং এ-বিষয়টি এখন বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রদর্শন করার নানা কৌশল নিয়ে গত

চার দশক জুঁড়ে গবেষণা চলছে। 'জাদুঘর তত্ত্ব' হিসেবে একটি ডিসকোর্স বিস্তর জনপ্রিয় হয়েছে যাকে আবার 'জাদুঘর বিজ্ঞান' হিসেবেও চিহ্নিত করা হচ্ছে। যেসব জাদুঘর বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করে সেগুলি শুধু নিছক বিজ্ঞানকেই প্রদর্শনীতে রাখে না, তারা বিশেষ ধরনের বিজ্ঞানকেও জনতার জন্য উৎপাদন করে এবং বিজ্ঞান তাদের বৈধতার অনুমোদন দেয়। পক্ষান্তরে বিজ্ঞান জাদুঘর হলো কিছু অনুশীলন ও প্রত্নবস্তু ঘোষণা করা যা যথার্থ অর্থে বিজ্ঞানের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত এবং বিজ্ঞান হিসেবে যা শিক্ষিত জনগণের চেনা কর্তব্য। অধিকন্তু বিশেষ বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খলার উন্নয়নের অংশ হিসেবে কিছু কিছু জাদুঘরের স্থান ও সংগ্রহ বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য সংঘটিত করা হয়। এভাবে তারা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে এবং 'সত্য' ও 'বস্তুনিষ্ঠতা'র বৈজ্ঞানিক ধারণাকে সম্পৃক্ত ও নির্ধারণ করতে সহায়তা করছে।[৯] একই সময়ে জাদুঘর ব্যাপক ভাবে বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতিও পেয়েছে। সাব্যস্ত করতে পেরেছে যে, তারা সুবিন্যস্ত এবং সর্বাত্মক নীতি অনুসারে সংগঠিত হয়েছে। আর এই নীতিগুলো ক্ষমতা-রাজনীতি থেকে পৃথক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

ক্ষমতা বিস্তারের ক্ষেত্রে রেপিজেন্টেশনের সুনির্দিষ্ট কাঠামোর পরম্পরাকে পর্যবেক্ষণ করাও বর্তমান প্রবন্ধের একটি অন্যতম কাজ। অর্থাৎ প্রদর্শনের বিশেষ 'মুড' দ্বারা কে ক্ষমতা প্রাপ্ত বা ক্ষমতা চ্যুত হয়? জাদুঘরের সাংস্কৃতিক চর্চার মধ্যে সবচেয়ে উৎপাদনশীল তাত্ত্বিক উন্নয়ন হলো একটি জাদুঘরকে টেক্সট বা মিডিয়া হিসেবে বিশ্লেষণ করা এবং এটি একটি প্রস্তাবনা যে, এটা প্রদর্শনের রাজনীতির প্রশ্ন সফলভাবে যুক্ত। আর তাই, কখনও কখনও সূচিপত্রের দিকে সংক্ষিপ্তাকারে মনোযোগী হতে হয়। এটা আরও চিত্তাকর্ষক আকার ধারণ করে যখন এটা উৎপাদন (encoding/writing), উপভোগ (decoding/reading), একই সাথে বিষয়বস্তু বা (text) এবং এগুলোর মধ্যে আন্তঃসম্পর্কের বিষয়টি উন্মুক্ত করে।[১০] এই প্রস্তাবটি প্রদর্শনীতে ক্ষমতার বিতরণ এবং অর্থের স্থিরীকরণ সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নকে সংজ্ঞায়িত করে। উদাহরণ স্বরূপ– কে প্রদর্শনীর কর্তা? একজন প্রদর্শনী প্রস্তুতকারীর কী এজেন্সি আছে? কোন রাষ্ট্র রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক আগ্রহকে প্রবিষ্ট করে? দর্শনার্থী কীভাবে কল্পিত হয়? কে বাদ পড়ে যায়? প্রদর্শনীতে নিজেদের ভাষায় দর্শনার্থীগণ কতদূর পর্যন্ত নিজস্ব ভাষায় ব্যাখ্যা? এবং বিশেষ ধরনের প্রদর্শনীমূলক কাঠামো বা কৌশলকে বিশেষ পদ্ধতির পঠনকে কীভাবে সক্ষম করে তোলে? আরো সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায়, এটা একটা কৌশল যা সুনির্দিষ্ট শ্রেণির প্রযোজক, প্রদর্শনী ও দর্শনার্থীদের এবং ক্ষমতার বিভিন্ন ভাবে বিস্তারকরণ-এর আন্তঃসম্পর্কের মধ্যে প্রশ্ন উত্থাপনে সহযোগিতা করে যা প্রয়োজনীয় এবং গ্রহণযোগ্য।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ১৭ ও ১৮ নং গ্যালারিতে প্রদর্শিত প্রত্ন-প্রতিমাসমূহ

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে দু'ধরনের নির্মাণ উপকরণের প্রত্ন-প্রতিমাসমূহ প্রদর্শিত হতে দেখা যায়:

১. **কাঠের প্রত্ন-প্রতিমাঃ** ৩২ নং গ্যালারিতে কাঠের শিল্পকর্ম নামে কাঠের অন্যান্য নিদর্শনের সাথে প্রদর্শিত হয়েছে। এখানে রয়েছে সুর সুন্দরী নামে একটি কাঠের নারী ভাস্কর্য।

২. **পাথরের প্রত্ন-প্রতিমা:** ১৭ ও ১৮ নং গ্যালারিতে প্রদর্শন করা হয়েছে। এ-গ্যালারি দুটিতে যে প্রত্ন-প্রতিমা রয়েছে তার মূর্তি তত্ত্ব বিদ্যার আলোকে দুটি ধরন লক্ষ্য করা যায়। তা হলো:

ক) **স্বতন্ত্র প্রত্ন-প্রতিমা:** গৌরী, মনসা, সরস্বতী, দুর্গা, চণ্ডী, মহামায়া, যক্ষী, মারিচি, পর্ণ-শর্বরী ইত্যাদি।

খ) **যুগল প্রত্ন-প্রতিমা:** লক্ষ্মী–নারায়ন, উমা-মহেশ্বর, হর-গৌরী, কল্যাণ-সুন্দর প্রভৃতি।

এছাড়াও এদেরকে মূর্তির চরিত্র অনুযায়ী দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন:

১. **সৌম্য প্রত্ন-প্রতিমা:** গৌরী, সরস্বতী, লক্ষ্মী-নারায়ন, হরগৌরী

২. **উগ্র প্রত্ন-প্রতিমা:** দুর্গা, মারিচি প্রভৃতি।

সামগ্রিক ভাবে যে প্রত্ন-প্রতিমা সমূহ রয়েছে তা একটি ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো:

বৌদ্ধ প্রত্ন-প্রতিমা	সেঁতাত পত্রা (সংগ্রহ নং ১১১৫), ভ্রুকটি তারা (সংগ্রহ নং ৬৬.৪০), মহাপ্রতিসরা (সংগ্রহ নং ৮১), পর্ণশবতরী (সংগ্রহ নং ৬৭), শ্যামতারা (সংগ্রহ নং ২১), মারিচি (সংগ্রহ নং ৪৬), হারীতি (সংগ্রহ নং ই-৫২) ইত্যাদি।
হিন্দু প্রত্ন-প্রতিমা	গজ-লক্ষ্মী (সংগ্রহ নং ৬৬.৫), মা ও শিশু (সংগ্রহ নং ই-৭৫.৩২৪), সরস্বতী (সংগ্রহ নং ই-৫০), মনসা (সংগ্রহ নং ই-৮), সূর্য মূর্তিও সহযোগী হিসেবে ৪টি নারী (সংগ্রহ নং ৭২), দুর্গা (সংগ্রহ নং ৬৯.১৩১), কল্যাণ-সুন্দর (সংগ্রহ নং ৩৫), উমামহেশ্বর (সংগ্রহ নং ৩৬), উমামহেশ্বর-২ (সংগ্রহ নং ৬৭.২৩৩), গৌরী (সংগ্রহ নং ৬৬.৩৫), মহামায়া (সংগ্রহ নং ৬৯.১৭), চণ্ডী (সংগ্রহ নং ১১২৩), স্তম্ভে দণ্ডায়মান নারী ভাস্কর্য (সংগ্রহ নং ৭৫.২৯৫), নাগ দরজায় ৪টি নারী উপর থেকে নীচের দিকে তাকানো।

আধিপত্যবাদী জাদুঘরীয় রেপ্রিজেন্টশন-এর পর্যালোচনা

উল্লেখিত বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ১৭ ও ১৮ নং গ্যালারিতে প্রদর্শিত প্রত্ন-প্রতিমার অনেকেই ফ্রান্সে গিয়েছিলেন বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরার জন্য। অর্থাৎ জাতীয় পরিচয়কে সমুন্নত করার লক্ষে। এসব প্রত্ন-প্রতিমা যেভাবে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্থের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে রেপ্রিজেন্টেড হচ্ছে এবং বিদেশ ভ্রমণের মাধ্যমে দেশীয় সংস্কৃতির দূতিয়ালিতে ব্যবহৃত হয়েছে এবং একই সাথে আমাদের জাতীয়

ঐতিহ্যের গর্বিত সেক্যুলার প্রদর্শনীর অংশ হিসেবে রেপ্রিজেন্টেড হচ্ছে বা হয়েছে এবং হতে থাকবে।

আলোচ্য প্রত্ন-প্রতিমা সমূহ যখন সামাজিক প্রেক্ষিতে ছিল তা ছিল দেবীর মর্যাদা প্রাপ্ত। সেখানে মানুষের সাথে তাদের ছিল দেবী-ভক্ত সম্পর্ক। নিত্যদিন মানুষ তাদেরকে পূজা করতো। তাদের তুষ্ট রাখতে উৎসর্গ করতো ফুল, দুধ, কলা সহ বিভিন্ন উপহার। তাদের দৃষ্টিতে যৌনাকাঙ্খার প্রকাশ ছিল অনুপস্থিত। মূলত: ছিল শ্রদ্ধা, আশির্বাদের আকুতি ও অভিসম্পাতের ভয়। কিন্তু যখন তাকে সেখান থেকে জাদুঘরে তুলে আনা হলো সে হয়ে উঠল শিল্প বস্তু (Banerji 1990, Bhattasali 2008, Haque 1992)। সে আর ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত রইল না সে সম্পর্কিত হলো ঐতিহ্যের সাথে। তাকে আর কেউ পূজা করতে আসে না আসে তার সৌন্দর্য দেখতে। সে দেখার মধ্যে দেশি, বিদেশি ও বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের দর্শক ও গবেষকগণ থাকেন। তাদের দৃষ্টিতে দেবী আর আরাধনার বিষয় থাকেন না। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে যে প্রত্ন-প্রতিমাসমূহ রয়েছে তাদের বেশির ভাগই নন্দনতত্ত্বের আলোকে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং বিভিন্ন গবেষণা প্রবন্ধে তাদের সম্পর্কিত যে বর্ণনা প্রকাশ করা হয়েছে তা থেকে স্পষ্টই অনুমিত হয় পুরুষের ভোগবাদিতার রেপ্রিজেন্টেশন।

মূর্তিতত্ত্বে যেভাবে প্রত্ন-প্রতিমা বিশ্লেষিত হয় তার কৌশলও পুরুষ ভোগবাদিতাকেই ইঙ্গিত করে। সেখানে প্রত্ন-প্রতিমার শারীরিক গড়নের বর্ণনা, তার দাঁড়ানোর ভঙ্গি, হাত–পায়ের অবস্থান, পোশাকের ধরন, পোষক পরিধান রীতি, চুলের ধরন, তার পাশে অবস্থানরত অন্যান্য বিষয়ের উপস্থিতি, তার বাহন, মিথ ইত্যাদিকে আলোকপাত করা হয়। যা প্রত্ন-প্রতিমা সমূহকে মাতৃ দেবী থেকে ট্রান্সফর্ম করে; নিরেট শরীর সর্বস্ব নারীর রূপান্তর ঘটায়। এই রূপান্তর প্রক্রিয়ায় সে পুরুষের কুরুচিপূর্ণ ব্যাখ্যান ও আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে প্রেক্ষিতবিহীন হয়ে পড়ে। কয়েকটি উদাহরণ-এর মাধ্যমে এগুলো বোঝা সম্ভব—

প্রথমত, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ১৭ নং গ্যালারিতে সরস্বতী দেবীর প্রত্ন-প্রতিমাকে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ-প্রত্ন-প্রতিমার হাতে ধরা আছে বীণা এবং পাশে রয়েছে তার বাহন সাদা হংস। আইকোনোগ্রাফি ডিসকোর্সের আলোকে তাকে যেভাবে বর্ণনা করা হয় তাতে তার প্রশস্ত 'নিতম্ব', উদগত 'বক্ষ' এবং তার শারীরিক পোশাকের বর্ণনা থাকে। এই বিষয়গুলো দর্শনার্থী ও গবেষকরা একটি ফ্যান্টাসির জায়গা থেকে দেখেন। সাধারণ মানুষের কাছে সরস্বতী যেমন বিদ্যার দেবী, জাদুঘরে সে আর বিদ্যার দেবী থাকেন না, কারণ জাদুঘরীয় বর্ণনা এবং প্রেক্ষিতবিহীন অবস্থার রেপ্রিজেন্টেশনে সে হয়ে ওঠে পুরুষের ফ্যান্টাসির বস্তু।

দ্বিতীয়ত, যে উদাহরণটি ব্যবহার করব তা হচ্ছে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ১৭ নং গ্যালারিতে উমা-মহেশ্বর প্রত্ন-প্রতিমাটি। এটি একটি যুগল প্রত্ন-প্রতিমা, এতে উমা ও মহেশ্বর এর বিয়ের বিষয়কে উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে শিল্পী মহেশ্বর-এর উরুর ওপর উমার অবস্থানকে দেখিয়েছেন। এতে মহেশ্বর-এর এক হাত উমার চিবুকে ধরে

আছেন এবং অন্য হাতে উমার এক স্তনে হাত বুলাচ্ছেন। প্যানেলের ওপরের অংশে বিষ্ণু রয়েছেন এবং চারপাশে রয়েছে বিভিন্ন জিনিস হাতে নিয়ে উমার সখীরা। এখন প্রশ্ন হলো দর্শক একে কীভাবে গ্রহণ করবেন? যেখানে দেব-দেবী হিসেবে উমা-মহেশ্বরকে পূজা করা হত সেই প্রত্ন-প্রতিমা কিন্তু এখানে প্রেক্ষিত বিহীন অবস্থায় তা হয়েছে পুরুষ গবেষক ও দর্শকের ভোগবাদী বর্ণনার একটি জায়গা। গুহ-ঠাকুরতা (২০০৪: ২০৬) তাই ভোগবাদিতার প্রশ্নে বলেন শিল্পের নামে নারীকে এভাবে খুঁটিয়ে দেখা এবং নারীর বিশেষ অঙ্গকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা বর্তমান গবেষকদের কাছে দোষের নয় বরং প্রশংসার হয়ে দাঁড়িয়েছে। নারীবাদীরা নারীর এ-ধরনের সৌন্দর্য বিশ্লেষকে দেখিয়েছেন পুরুষের অপারেশন হিসেবে।

তৃতীয়ত, প্রত্ন-প্রতিমার গ্যালারির একটি উল্লেখযোগ্য প্রত্ন-প্রতিমা হচ্ছে মনসা। সে সাপের দেবী। মনসা প্রত্ন-প্রতিমার স্টেলাতে ৭ টি সাপ, কোলে শিশু ও হাতে গাছের অংশ ধরা আছে তার সাথে জড়িয়ে আছে চাঁদ সওদাগর এর দ্বন্দ্বের মিথ। তাকে উত্তর পূর্ব ভারত সহ বাংলার সাধারণ মানুষ ভয় পায় এবং পূজা করে। কিন্তু মনসা দেবী যখন জাদুঘরে আসে তখন সে হয়ে ওঠে সৌন্দর্যের প্রতীক, সে হয়ে পড়ে জনগণের আকর্ষণের বস্তুতে পূজা বা ভয়ের নয়।

চতুর্থত, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে লক্ষ্মীর রয়েছে দুই ধরনের প্রত্ন-প্রতিমা।একটি হচ্ছে গজ– লক্ষ্মী আর একটি হচ্ছে লক্ষ্মী–নারায়ণের। লক্ষ্মী–নারায়ণ প্রত্ন-প্রতিমাতে লক্ষ্মী ও তার বর নারায়ন এর প্রতিকৃতি রয়েছে। লক্ষ্মী হচ্ছে ধন রত্নের দেবী, প্যাঁচা তার বাহন সে গবেষকদের কাছে চর্চিত হয় তার সৌন্দর্য, জমকালো পোশাক, অলংকার ও সুন্দর দেহ-গড়নের জন্য।

পঞ্চতম, এখন আসা যাক কাঠের প্রত্ন-প্রতিমা। ৩২ নং গ্যালারিতে মুন্সীগঞ্জের কসবা হতে পাওয়া একটি কাঠের প্রত্ন-প্রতিমাকে এখানে উপস্থাপন করা। এর নাম সুরসুন্দরী। তার বর্ণনায় উল্লেখ করা আছে সুরসুন্দরী ত্রিভঙ্গ রতিতে দণ্ডায়মান। তার ডান হতে কাঁধের ওপর এবং বাম হাত কোমরের কাছে রয়েছে ডান পায়ের ওপর দণ্ডায়মান এই প্রত্ন-প্রতিমার বাম পা বাঁকান। এখান প্রশ্ন হচ্ছে এই সুরসুন্দরী আমাদের কাছে কী উপস্থাপন করে ? গুহ-ঠাকুরতা (২০০৪: ২২৮ ও ২২৯) একই অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন তার লেখায়। তিনি দিদারগঞ্জের যক্ষীর[২৫] জীবন বৃত্তান্ত আলোচনা করেন যা আমাদের বুঝতে সাহায্য করে যক্ষীর পরিচয় বদলের ইতিহাস কীভাবে আর্ট-হিস্টরি-এর ডিসকোর্সের মধ্যে ঔপনিবেশিক ও জাতীয় পরিসরের নির্মিত ও পরিবেশিত হয়েছে। ভারত সম্পর্কিত প্রাচ্যবাদী ও জাতীয় গবেষণার অন্যতম এক ক্ষেত্র ছিল আর্ট-হিস্টরি। একদিকে প্রাচ্যবাদী ভারত নির্মাণ অন্যদিকে ভারতীয় জাতীয় পরিচয় নির্মাণ উভয় প্রকল্পের মধ্যেই ভারতের গৌরব হিসেবে বিবেচিত হয়েছে এ-শিল্প। এই শিল্পের অন্যতম ক্ষেত্র হলো প্রত্ন-প্রতিমা। প্রাচ্যবাদী ও জাতীয় প্রকল্পের আওতায় সারা ভারতেই প্রত্ন-

প্রতিমার অনুসন্ধান শুরু হয়। ভারতের স্বাধীনতার বছর ভারত ও পাকিস্তানের অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধিত্বকারী প্রত্ন-প্রতিমা হিসেবে এটি বিদেশ ভ্রমণ করে। ১৯৮৬ পর্যন্ত এই ভ্রমণ অব্যাহত থাকে।[১১]

যক্ষীর এই জীবন বৃত্তান্ত থেকে আমাদের বিশ্লেষণ এমন যে, যদি একে যক্ষী হিসেবে অথবা বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে প্রদর্শিত নিরাভরণ প্রত্ন-প্রতিমাসমূহকে 'দেবী মূর্তি' হিসেবে শনাক্ত করা হয় তবে প্রত্ন-প্রতিমা সমূহ ধর্মচর্চার সাথে যুক্ত এবং এর বেশিরভাগই সম্পদ ও উর্বরতার প্রতীক। যদিও প্রতীক শব্দটি গ্রহণযোগ্য নয়। অর্থাৎ যখন যক্ষী বা প্রত্ন-প্রতিমাসমূহ ধর্মালয়ে তখন এর সঙ্গে ব্যবহারকারী মানুষের সম্পর্ক এক ধরনের এবং একে কেন্দ্র করে তার এক ধরনের পরিচয় রয়েছে যা হলো এটি দেবী এবং পূজনীয়। কিন্তু যক্ষী যখন ভারতীয় শিল্প হিসেবে নির্মিত হয় এবং প্রত্নতাত্ত্বিক একটি অজেক্ট বা অ্যান্টিকুইটি হিসেবে পরিচিত পায় তখন এর পূর্বতন পরিচয় এবং এর সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের বদল ঘটে। এটি তখন ঐতিহাসিক বস্তু যার স্থান ধর্মালয় নয় জাদুঘরে। এসব ভাস্কর্য বা মূর্তি সমূহকে পূজা করা কর্ম নয়, দরকার গবেষণা করে দেশ ও জাতির গৌরব হিসেবে তুলে ধরা। দেবী থেকে তার পরিচয়ের বিশেষ বদল সম্ভব হয় ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব ডিসকোর্স এবং ঔপনিবেশিক ও জাতীয় ক্ষমতা কাঠামোর মধ্য দিয়ে। গুহ-ঠাকুরতা ব্যাখ্যা করেন এই নতুন যক্ষীকে অথবা বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের উল্লেখিত গ্যালারি দুটির প্রত্ন-প্রতিমা সমূহ জাদুঘরের মধ্যে প্রেক্ষিতহীন অবস্থায় কেবল সৌন্দর্য ও ইতিহাসের বস্তু হিসেবে অদ্ভুত এক রেপ্রিজেন্টেশনের মধ্যে চলে আসে এসব প্রত্ন-প্রতিমাসমূহ। এর নাম হয় মুভাবল অ্যান্টিকুইটি; আর্ট অজেক্ট' ইত্যাদি। দর্শক তাকে দেখতে আসে, তার পূজা করতে নয়। দর্শকদের চাহিদা মিটানো ও বিশ্বব্যাপী শিল্প প্রদর্শন প্রকল্পে দিদারগঞ্জ যক্ষীকে আন্তর্জাতিক দর্শকের মুখোমুখি হয়ে দেশ ও জাতীয় গৌরব অর্জন করতে দেখি। একই অভিজ্ঞতা সাম্প্রতিক সময়ের ফ্রান্সের গিমে জাদুঘরে প্রদর্শিত আমাদের প্রত্ন-প্রতিমার ক্ষেত্রেও ঘটতে দেখি।

গুহ-ঠাকুরতার (২০০৪: ২৩৩) আলোচনা ধরে বলা যায় নারী শরীরকে ঘিরে সৌন্দর্যের যে ডিসকোর্স তৈরি হয়েছে তার অন্যতম আধার শিল্প সংক্রান্ত ধারণা। এই ধারণায় নারীর শরীরের অনাবৃত প্রদর্শনী অপরাধের নয় বরং প্রশংসা ও অর্জনের। পুরুষতান্ত্রিক আধুনিক শিল্পের ডিসকোর্স আইকোনোগ্রাফিকে বিশেষ তাৎপর্য প্রদান করে। অতীতে নির্মিত প্রত্ন-প্রতিমা বর্তমানে ভোক্তাদের সৌন্দর্য পিপাসা নিবারণের খোরাক জোগায়। যাকে সাহায্য করে প্রত্নতত্ত্ব, মূর্তিতত্ত্ব প্রভৃতি ডিসিপ্লিন শরীর গবেষণার জন্য উন্মুক্ত হয় এবং সুযোগ তৈরি হয় নারীর শরীর সম্পর্কে পুরুষের যে ফ্যান্টাসি তা পূরণের; এই কারণে নারীর নমনীয় শরীর, বিশেষ অঙ্গের গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা ও প্রদর্শন, পোশাকের বিভিন্নরকম ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে পুরুষ লিপ্ত নারীর শরীরের ওপর। এই কারণে নারীবাদীগণ 'বিউটি'কে নারীর ওপর পুরুষের একটি অপারেশন হিসেবে দেখেন। গুহ-ঠাকুরতা শিল্পের নামে নারীর শরীরের গবেষণা, প্রদর্শন ও পরিচয় নির্মাণকে ভারতের উত্তর ঔপনিবেশিক মিডিয়া সংস্কৃতিতে নারীর রেপ্রিজেন্টেশনের সাথে তুলনা করেছেন। নারীর ওপর পুরুষের যে আধিপত্য তা নির্মিত হয়েছে বহু ঐতিহাসিক

পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যার মধ্যে অন্যতম হিসেবে আমরা মনে করছি ভারতীয় প্রেক্ষিতে শিল্প (প্রত্ন-প্রতিমা) চর্চা যা নিরাভরণ নারীকে প্রদর্শিত করতে সাহায্য করে, তাকে নড়াচড়া করতে সাহায্য করে। প্রত্নতত্ত্বের নারীবাদী সমালোচনায় জোয়ান গেরু, জনষ্টান প্রমুখগণ[১২] দেখিয়েছেন পুরুষ সব সময় নারীকে প্রত্নতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে অধস্তন করে রেখেছে আর মূর্তিতত্ত্বের এ-ধরনের বিশ্লেষণ নারীকে সৌন্দর্যের বিষয় বানিয়ে অধস্তন করার একটি প্রকল্প। প্রত্নতাত্ত্বিক বা মূর্তিতাত্ত্বিকদেরকে এ-বিষয় নিয়ে খুব একটা গবেষণা করতে দেখা যায় না।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে যে প্রত্ন-প্রতিমা সমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে তা তার সত্তা হারিয়ে একটি নিথর শিল্প বস্তুতে পরিণত হয়েছে। এখানে নারী শুধু সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে প্রতীকীকরণ করা হয়েছে। সারসত্তাকৃতভাবে তাদের বর্ণনায় এটি আসে না যে, নারী সৌন্দর্যের প্রতীক ছাড়াও মা, বোন, অর্ধাঙ্গিনী এবং সে পরিবার ও সমাজের একটি মানুষ এবং সমাজ গঠনে তার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। গবেষকদের চর্চায় নারীর এই লৌকিক কাজগুলো কখনোই উঠে আসে না বা দর্শকের দৃষ্টিতেও বিষয়গুলো প্রায়শই অনুপস্থিত। সবাই প্রত্ন-প্রতিমাগুলোকে ব্যাখ্যা করে তাদের ফ্যান্টাসির জায়গা থেকে। লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরসহ অপরাপর জাদুঘরে প্রদর্শিত বিভিন্ন প্রত্ন-প্রতিমাসমূহের বিশেষ রেপ্রিজেন্টেশন কৌশলের মাধ্যমে এই ভূখণ্ডের প্রাচীন নারীকে কী খুঁজে পাওয়া সম্ভব? প্রেক্ষিতবিহীন রেপ্রিজেন্টেশন ও গবেষণার নির্মাণ এমনভাবে করা হয় যার সাথে প্রাচীন নারীর দৈনন্দিন জীবন ও সংগ্রাম এবং তার আকাঙ্ক্ষার কোনো সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না। বরং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাবে, প্রাচীন ভারত এবং বাংলার প্রত্ন-প্রতিমাসমূহে 'নারী' এমনভাবে নির্মিত যার মাধ্যমে 'পুরুষ' তার ফ্যান্টাসি এবং অবসেশন যাপন করতে পারে। বর্তমান প্রবন্ধের শুরুতেই এই উদযাপনের কতিপয় চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে উল্লেখিত প্রত্ন-প্রতিমাসমূহের প্রদর্শন ও গবেষণার মধ্য দিয়ে কখনই এই ভূখণ্ডের প্রাচীন নারীর জীবন অথবা সমাজে তাদের অবস্থানকে তুলে আনার চেষ্টা করা হয় নি। বরং নন্দনতত্ত্বের অধীনে প্রত্ন-প্রতিমাসমূহ কেবল শিল্প মূল্য বিচারের বস্তুতে পরিণত হয়েছে। এসব প্রত্ন-প্রতিমাসমূহে নারী হিসেবে নারী অনুপস্থিত। নারী হিসেবে সে কোনো অর্থ ধারণ করে না। পক্ষান্তরে, অর্থ সৃষ্টি করে। প্রদর্শিত এসব প্রত্ন-প্রতিমাসমূহে নারী সাবজেক্ট হিসেবে নয় বরং অবজেক্ট হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। অর্থাৎ পুরুষের যৌন ভোগবাদিতার 'আইটেম'-এ পরিণত হয়েছে।

এভাবে শিল্প নিদর্শন হিসেবে প্রত্ন-প্রতিমাসমূহের রেপ্রিজেন্টেশন এবং গবেষণার প্রত্নতাত্ত্বিক অনুশীলন সমাজে নারীর নিজস্ব সত্তা নির্মাণে কোনো ভূমিকা পালনের পরিবর্তে এই অনুশীলন একদিকে যেমন নারীকে পুরুষের ফ্যান্টাসিতে পরিণত করেছে অপরদিকে নারীর প্রতি পুরুষের যৌন ভোগবাদিতাকে ঐতিহ্যিক প্রামাণিকতা দান করেছে; যা প্রকারান্তরে, বর্তমান নারীর ওপর পুরুষ 'বেটাগিরি' এবং নারী সম্পর্কিত সৌন্দর্যের অধিপতিশীল ধারণাগুলোকে পুনঃ উৎপাদিত করতে সাহায্য করে।

ফুকর মতে, রেপ্রিজেন্টেশন জ্ঞান উৎপাদন করে। রেপ্রিজেন্টেশনের মাধ্যমে আইডেন্টিটি নির্মিত হয়।[১৩] এই বিষয়টি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের প্রত্ন-প্রতিমা সমূহের উপস্থাপন পদ্ধতিকে প্রশ্ন সাপেক্ষ করে তোলে। আসলেই আমাদের কাছে তাদের কী আইডেন্টিটি তৈরি হয় ?

আজকের প্রবল 'বাঙালি মুসলমানের' বাংলাদেশের জাদুঘরে প্রত্ন-প্রতিমা প্রদর্শনের অর্থও একই হয়ে ওঠে। অপরকে প্রদর্শন। কদর্য, অশ্লীল, অপরিণামদর্শী, আদিম অতীত এবং সংস্কৃতির এক ঔপনিবেশিক জ্ঞানতাত্ত্বিক রেপ্রিজেন্টেশন। বর্তমান বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সংখ্যাগরিষ্ঠ দর্শক এ ধরনের প্রদর্শনীকে অপর বা প্রতিপক্ষ ধর্মীয় সংস্কৃতির প্রদর্শন হিসেবে প্রতীয়মান করে। সংখ্যালঘু অংশের কর্তৃত্ব পরায়ণ অংশ এবং সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতাহীন অংশ আধুনিকতা ও সেক্যুলারকরণ প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় বর্তমান লেখার শুরুতেই উল্লেখ্য প্রমোদ চন্দ্রের কিউরেটোরিয়াল নোটের মতো আচরণ করে। যৌন আবেদনময়ী নগ্ন প্রত্ন-প্রতিমা গবেষণার অধীনে ইতিহাসকে জানতে সহায়ক ভূমিকা পালন করুক না কেনো বা উর্বরতার প্রতীক বা মাতৃ দেবীর মর্যাদা লাভ করুক না কেনো– তা সেক্যুলারকরণের চাপে ইতিহাস রচনার রাজনীতির অধীনে হিন্দুত্ববাদী কর্তৃত্ব স্থাপনের এবং মুসলিম পূর্ব সময়কে ঐশ্বর্যশালী সময় হিসেবে চিহ্নিতকরণে সবসময়ই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। পদ্ধতিগত, আধুনিক, সেক্যুলার রেপ্রিজেন্টেশনের প্রক্রিয়ায় আজকের বাংলাদেশে প্রত্ন-প্রতিমার পরিচয় লিখিতভাবে নির্ধারিত থাকলেও দর্শনার্থীদের কাছে এক 'নগ্ন', 'উত্তেজক', 'যৌন আবেদনময়ী' নারী ব্যতীত আর কোনো অর্থ উপস্থাপন করতে পারছে কী? শেষ পর্যন্ত ১৮৫০-১৯২৫ পর্যন্ত ইউরোপে হটেনটট নারীকে প্রদর্শনের কৌশল-এর সাথে কী আজকের জাতীয় জাদুঘরে প্রত্ন-প্রতিমা প্রদর্শনের এবং প্রদর্শিত বস্তুর সাথে দর্শনার্থীদের আচরণগত ভিন্নতা কী খুঁজে পাওয়া যাবে?

পরিশেষে

আমরা ২০ জন নিরাভরণ নারীকে কোনো প্রকাশ্য স্থানে দাঁড় করিয়ে রাখতে পারি না কিন্তু বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে আইকোনোগ্রাফি গ্যালারিতে ২০ জন নিরাভরণ প্রত্ন-প্রতিমাকে দাঁড় করিয়ে রাখতে পারি; উন্মুক্ত করে দিতে পারি। প্রশ্ন করতে হবে এই ধরনের রেপ্রিজেন্টেশন প্রক্রিয়ার উদ্ভবের কারণ ও পরিস্থিতিকে এবং ব্যাখ্যা করতে হবে তার মাধ্যমে দর্শকের কাছে কী নির্মিত হচ্ছে? এ-হচ্ছে নারীর ওপর পুরুষের ক্ষমতার জাদুঘরীয় স্মারক; উদ্ভট, প্রেক্ষিতহীন অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকা। তারা 'যক্ষী', 'লক্ষী'র প্রত্ন-প্রতিমার মাধ্যমে আসলে কী শিক্ষা আমাদের দিতে পারে বা দেয় সেটা যেমন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তেমনি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো এদেরকে কেনো এভাবে দাঁড় করিয়ে রাখতে হয়? কোন সমাজে এই প্রয়োজনীয়তা উদ্ভূত হয়, কখন, কীভাবে? এটা কী মানব প্রগতির অংশ না উপনিবেশ ও আধুনিকতাবাদী প্রকল্পে সাজেক্টের যে ক্রম রূপান্তরের ইতিহাস, ধ্বংসের ইতিহাস তার অংশ? বাংলাদেশের কোনো প্রান্তিক অংশে প্রাপ্ত শিবলিঙ্গকে কেনো জাদুঘরে রাখতে হয়? জাদুঘরের চার-দেয়ালে অন্যসব প্রত্নবস্তুর মধ্যে এর নতুন কোনো অর্থ নির্মিত হয়? প্রতিদিন অগণিত দর্শক যখন একে দেখে তখন তার সম্পর্কে কী

ধারণা তৈরি হয় বা তারা পায় বা নেয়? জাদুঘরে শিব লিঙ্গের আদৌ যেভাবেই যত পরীক্ষিত উপায়েই প্রদর্শন করা হোক না কেনো তা আসলে কি তার প্রাক জাদুঘরীয় পরিচয়কে তুলে ধরতে পারে?

টীকা

১। আমি এখানে আহমেদ (২০০৪: ৯৬)-এর বক্তব্যটি তুলে দিচ্ছি, কারণ, আহমেদও একই ভাবে রেপ্রিজেন্টেশন শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন বেশ কয়েকটি 'প্রদর্শন', 'পরিবেশন' অথবা 'উপস্থাপন'-এর মত বাংলা শব্দ থাকার পরেও। তার মতে, ...রেপ্রিজেন্টেশন শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে "পরিবেশন", "উপস্থাপন" ব্যবহৃত হয়েছে। ...প্রতিশব্দ বাছাইয়ে ইংরেজি 'রেপিজেন্টেশন'-এর বহু সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা বাদ দেয়া যেতে পারে (এটা হবারই কথা যেহেতু বাংলা শব্দের অর্থ-সঞ্চারণের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস ভিন্ন) কিন্তু বর্তমানের ইংরেজি ভাষাভাষী জগতে যে প্রধান দুটো অর্থ বিদ্যমান (ক) ইমেজ, অনুরূপতা/সাদৃশ্যতা কিংবা পুরুৎপাদন এবং (খ) প্রতিনিধিত্ব-করা বা প্রতিনিধি দ্বারা মতামত উপস্থাপিত/রেপ্রিজেন্টেড হওয়া—তা একই শব্দে নিহিত না-থাকলে, রেপ্রিজেন্টেশনকে ঘিরে সমসাময়িক জমানার কিছু তর্ক/লড়াইয়ের অর্থ ধরতে-পারাটা কঠিন ("আমার সম্বন্ধে লেখার/আমাকে প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার তোমাকে কে দিল হে?")। এই কারণে, আমি এই প্রবন্ধে ইংরেজি শব্দটি ব্যবহার করেছি; ক্ষেত্র-বিশেষে, তাত্ত্বিক আলোচনার অল্প-স্বল্প কিছু জায়গায় "প্রদর্শন", "উপস্থাপন", "পরিবেশন", "প্রতিনিধিত্ব"—এই শব্দগুলো ব্যবহার করেছি যেখানে আমার মনে হয়েছে পুরো পরিসর জুড়ে রয়েছে শুধুমাত্র সেই অর্থটি।

২। *"[She stands before us as] one of the earliest visual statements of the Indian ideal of feminie beauty, an idela that finds constant expression throughout Indian art and literature. Wide hips and full breasts, physical attributes associated specifically with birth and fertility are exphasised. The sculptor played upon a common poetic concept when he made the torso bend forward under the weight of the breasts heavy with milk ... [to highlight] this ancient conception of beauty as abundance and productivity."* – Promod Chandra, *The Scupture of India* (Guha-Thakurata 2004: 205).

৩। "uabashed and smirking"-কানিংহামের এই বক্তব্যটি গুহ-ঠাকুরতার (২০০৪: ২২২) বইয়ের "For The Greater Glory of Indian Art: Travels and Travails of a Yakshi" প্রবন্ধটি থেকে নেয়া হয়েছে।

৪। "...at least certain classes of women must have been in the usual habit of appearing in public almost naked"—কানিংহামের এই বক্তব্যটি গুহ-ঠাকুরতার (২০০৪: ২২২) বইয়ের "For The Greater Glory of Indian Art: Travels and Travails of a Yakshi" প্রবন্ধটি থেকে নেয়া হয়েছে।

৫। কুমারাস্বামীর এই আলোচনাটি গুহ-ঠাকুরতার (২০০৪: ২২২) বইয়ের "For The Greater Glory of Indian Art: Travels and Travails of a Yakshi" প্রবন্ধটি থেকে নেয়া হয়েছে।

৬। জ্ঞান ক্ষমতার উৎপাদ, বিতরণ প্রভৃতি কাজ করতে সক্ষম তা ফুকো তার অর্ডার অব থিংস (১৯৭০) বইয়ের মাধ্যমে আমাদের সামনে বিস্তৃত পরিসরে তুলে ধরেন।

৭। ওয়াল্টার বেঞ্জামিনের (১৯৩৬) "The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction" নামের বিখ্যাত প্রবন্ধটি অনলাইনে পড়ুন http://bid.berkeley.edu/bidclass/readings/benjamin.html।

৮। আধুনিক জাতি-রাষ্ট্রের সেক্যুলার পাবলিক স্পেসের এবং রিলিজিয়াস প্রাইভেট স্পেসের ধারণার বিস্তারিত পর্যালোচনা দেখুন তালাল আসাদ (২০০৩)-এর প্রবন্ধ "Secularism, Nation-State and Religion"-এ।

৯। দেখুন ম্যাকল্যান্ডের (১৯৯৬) প্রবন্ধ "Theorizing museums: an introduction" টি।

১০। The 'encoding' / 'decoding' vocabulary is from Hall's classic account of a textual approach to media (Hall 1980). For an account of a range of texual approaches to material culture see Tilley (1990); and for a brief discussion in relation to museums see Macdonald (1996).

১১। এটি ফ্রি স্ট্যান্ডিং, লাইফ সাইজ ফিমেল ফিগার। বার্নিশ করা, চুনার স্যান্ডস্টোন দ্বারা নির্মিত। এর এক হাত ভাঙ্গা এবং অন্য হাতে একটি লম্বা চামরা ধরা যা কাঁধের ওপর দিয়ে পেছনে নেমে গেছে। একে যক্ষী হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে এবং নির্ধারণ করা হয়েছে মৌর্য যুগ অর্থাৎ তৃতীয় খ্রিস্টপূর্বাব্দ-এ।

১২। আবিষ্কারের পর একে পাটনার প্রাদেশিক জাদুঘরে নিয়ে যাওয়া হয় ১৯১৭ সালে। ভারতের স্বাধীনতার বছর ভারত ও পাকিস্তানের অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধিত্বকারী ভাস্কর্য হিসেবে এটি বিদেশ ভ্রমণ করে। লন্ডনে একটি প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়। ১৯৪৮ সালে দিল্লিতে ফেরত আসে এবং মাস্টার পিস অব ইন্ডিয়ান আর্ট হিসেবে গোভ.হাউস-এ প্রদর্শিত হয় এবং কয়েক বছর নয়া দিল্লির নিউ ন্যাশনাল মিউজিয়ামে থাকে। এরপর পাটনায় ফেরত আসে। ১৯৮০ সালে যক্ষী আবার বিদেশ ভ্রমণে যায়। ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্রে প্রদর্শিত হয়ে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করে এবং আন্তর্জাতিক দাবি ও দর্শকের চাপে ওয়াশিংটনের ন্যাশনাল গ্যালারি অব আর্ট এ প্রদর্শিত হয়। ১৯৮৬ তে যক্ষী স্বদেশে ফেরত আসে।

১৩। প্রত্নতত্ত্বে নারীবাদী ডিসকোর্স নিয়ে বিস্তারিত পরিসরে আলোচনাসমূহ দেখুন Cameron, A. & A. Kuhrt (eds.) (1983) *Images of Women in Antiquity* বই থেকে।

পাঠসূত্র

আহমেদ, রেহনুমা, ২০০৪, রেপ্রিজেন্টেশন (ও বাস্তবতা): কিছু পরিসর, কিছু প্রসঙ্গ, *কাউন্টার ফটো*, পৃষ্ঠা ৫৬-১০৫, ঢাকা: দৃক আলোকচিত্র গ্রন্থাগার লিমিটেড ও কাউন্টার ফটো—এ সেন্টার ফর কমিনিউকেশন।

আহমেদ, রেহনুমা এবং মানস চৌধুরী (সম্পাদিত) ২০০৩, *নৃবিজ্ঞানের প্রথম পাঠ : সমাজ ও সংস্কৃতি*। ঢাকা : একুশে পাবলিসার্স

Asad, T. 1993. The Concept of Ritual. In his *Genealogies of Religion, Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam*, Baltimore: The John Hopkins University Press.

Asad, T. 2003. Secularism, Nation-State and Religion. In his *Formation of the Secular: Christianity, Islam, Modernity*, Stanford: Stanford Univerisity Press.

Benerji, R. D. 1993. *Eastern Indian School of Mediaval Sculpture.* Delhi: Archaeology Survey of India.

Bhattasali, N. K., 2008. *Iconography of the Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum.* Dhaka: Bangladesh National Museum.

Cameron, A. & A. Kuhrt (eds.) 1983. *Images of Women in Antiquity.* London: Routledge.

Cole, H. H. 1874. *Catalogue of the Objects of Indian Art Exhibited in the South Kensington Museum.* London: South Kensington Museum.

Coomaraswamy, Ananda K. 1914. *Viśvakarmā ; examples of Indian architecture, sculpture, painting, handicraft.* London. http://www.archive.org/stream/cu31924022942993#page/n3/mode/2up

Fergusson, J. 1864. *One Hundred Stereoscopic Illustrations of Architecute and Natural History in Western India.* Photographs by Major Robert Gill, London: Cundall, Downes.

Foucault, M. 1970. *The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences* (trans. A. Sheridan). London: Tavistock.

Foucault, M. 1977. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison* (trans. A. Sheridan). London: Allen Lane.

Foucault, M. 1979. *The History of Sexuality Volume 1: An Introduction* (trans. R. Hurley). London: Allen Lane.

Guha-Thakurata, T. 2004. *Monuments, Objects, History.* New York: Columbia University Press.

Hall, S. 1980. Encoding/decoding. In S. Hall, D. Hobson, A. Lowe and P. Willis (eds.) *Culture, Media, Language*, pp. 128-38, London: Hutchinson.

Hall, S. 1997. The Work of Representation. In S. Hall (ed.) *Representation: Cultural Representation and Signifying Practices*, pp. 128-38, London: Sage Publication in association with the Open Universtiy.

Hall, S. 2001. The West and the Rest: Discourse and Power. In S. Hall and B. Gieben (eds.), *Formation of Modernity*, pp. 275-331, Polity Press: The Open University.

Haque, E. 1992. *Bengal Sculptures: Hindu Iconography*. Dhaka: National Museum.

Macdonald, S. 1996. Theorizing Museums: An Introduction. In S. Macdonald and G. Fyfe (eds.) *Theorizing Museum: Representing Identity and Diversity in a changing world (Sociological Review monograph)*, pp. 1-18, Oxford: Blackwell.

Mitra, R. 1972. *Buddha Gaya: The Hermitage of Sakya Muni*. Delhi: Indological Book House.

Molyneaux, B. L. (ed.) 1997. *The Cultural Life of Images: Visual Representation in Archaeology*. London: Routledge

Moser, S. and C. Gamble 1997. Revolutionary Images: The Iconic Vocabulary for Representing Human Antiquity. In B. L. Molyneaux ed. *The Cultural Life of Images: Visual Representation in Archaeology*, London: Routledge

Mullings, L. 1997. Ethnicity and Representations. In G. C. Bond and A. Gilliam (eds.) *Social Construction of the Past: Representation as Power*, London: Routledge.

Raz, R. 1834. *Essay on the Architecture of the Hindus*. London: Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland.

Stocking, Jr. G. 1987. *Vicotrian Anthropology*. New York: Free Press.

Summers, D. 1996. Representaion. In R. S. Nelcon and R. Shiff (eds.) *Critical Terms for Art History*, Chicago: The University Press of Chicago.

Tagore, A. 1914. *Some Notes on Indian Artistic Anatomy*, Trans. Sukumar Ray. Calcutta: Indian Society of Oriental Art.

Tilley, C. (ed.) 1990. *Reading Material Culture*. Oxford: Blackwell.